‘ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প : প্রতিরোধের শক্তি’–পাঠ প্রতিক্রিয়া

ইকতিজা আহসান

‘সর্বজনকথা’র আগস্ট ২০১৫ সংখ্যায় সামিনা লুৎফার ‘ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প : প্রতিরোধের শক্তি’ নামাধেয় লেখাটি পড়ে মনের মধ্যে কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হওয়ায় বর্তমান লেখাটির অবতারণা করা হলো। ২০০৬ সালে ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনির বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক গণ-আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। স্থানীয় সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে এই গণপ্রতিরোধ তখন ছিল দেশব্যাপী আলোচনার বিষয়বস্তু। সচেতন তরুণ-বৃদ্ধ প্রায় সকলে তখন এই আন্দোলনে গণপ্রতিরোধের শক্তি, আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, স্থানীয় নিম্নবর্গীয় মানুষদের বেপরোয়া অবস্থান, নারীর অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন, তেল-গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে যার যার মতো বিচার-বিশ্লেষণ, তর্কাতর্কি, দ্বিমত পোষণ করতে করতে মুখ-কালাকালি পর্যায়ে ঝগড়ায় বহু সময় পার করেছিলেন। আমিও বন্ধুদের সাথে এ বিষয়ে তখন কম আলোচনা করিনি। এই আগ্রহের জায়গা থেকে সামিনার লেখাটি আমার মনোযোগ কাড়ে। তাছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমরা ছিলাম সহপাঠী, এ কারণেও তাঁর লেখার প্রতি আমার একটা আগ্রহ ছিল। ফুলবাড়ী নিয়ে তিনি পিএইচডি করেছেন। ‘সর্বজনকথা’য় ছাপানো লেখাটি তাঁর পিএইচডি থিসিসের একটি অংশ।

রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের মুখে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি কেমন হবে–সেটা ছিল তাঁর মূল অনুসন্ধানের বিষয়। এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি রাসলারের (১৯৯৬:১৪৯) বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, রাসলারের মতে, আন্দোলনে দমন-পীড়ন পরবর্তী পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, নিরাপত্তা শঙ্কায় জনসম্পৃক্ততা হ্রাস পায়। কিন্তু ফুলবাড়ী আন্দোলনে তিনি ঠিক এর বিপরীত চিত্র দেখেছেন। তাঁকে সাধুবাদ জানাই। কারণ সেটা আমরাও দেখেছি।

তিনি বলেছেন, ‘দাবি আদায়ে ফুলবাড়ী আন্দোলনের অর্জিত সাফল্য উদাহরণ হিসেবে খুব একটা বেশি নেই।’ বোঝা গেল না যে এই মন্তব্য কি শুধু কয়লাখনি ও বাঁধসংশ্লিষ্ট দাবি আদায়ের আন্দোলন, নাকি দাবি আদায়ের যেকোনো আন্দোলন। যদি শুধু কয়লাখনি ও বাঁধসংশ্লিষ্ট দাবি আদায়ের আন্দোলন হয়, তাহলে সেটি ঠিক আছে হয়তো। কিন্তু যদি সার্বিক দাবি আদায়ের আন্দোলন হয়, তাহলে দাবি আদায়ের আন্দোলনে অর্জিত সাফল্যের সংখ্যা নেহাত কম নয় ইতিহাসে। শেরপুর-ময়মনসিংহের পাগলাই ধুমসহ ইতিহাসের কৃষক আন্দোলনগুলোতে আমরা দেখি সেখানে প্রতিটি আন্দোলনেই কিছু না কিছু দাবি অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও আমাদের দেশের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার পতনের দাবির আন্দোলনগুলো শেষ পর্যন্ত সফলতার সঙ্গে তার পরিসমাপ্তি টানে। লেখক ওপরে যদি দাবি আদায়ের ক্ষেত্রটি নির্দিষ্ট করে বলতেন, তাহলে আমাদের মতো আমপাঠকদের বুঝতে সুবিধা হতো।

যাক, এটা আমার মূল প্রশ্নের জায়গা নয়; আমার মূল প্রশ্নের জায়গা হচ্ছে, ক্ষমতাহীন একটি জনগোষ্ঠী কোন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল প্রকার দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকে রইল, তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি আবেগ ও কর্তব্যবোধ–এ দুই প্রত্যয়কে ঘিরে তাঁর অনুসন্ধান চালিয়ে নিয়েছেন, সেখানে।

‘আবেগ’ নামক একটি বড়-বয়ান (Meta-narrative) এর মধ্যে ফেলে ফুলবাড়ী আন্দোলনে গণপ্রতিরোধের শক্তিকে বিশ্লেষণ করাকে আমার কাছে খুব দায়সারা এবং অপূর্ণাঙ্গ মনে হয়েছে। মানুষের মধ্যে ‘আবেগ’ থাকবে। আদিষ্ট হয়ে সরকারি চাকরিজীবীরা বাদে মানুষের কোনো কাজই আবেগরহিত নয়। আর আন্দোলন বা প্রতিরোধ মানুষের একটি সচেতন অবস্থান (Position) নেওয়ার বিষয়। এরকম সচেতন অবস্থান নেওয়ার পেছনে ‘আবেগ’ যে থাকবে এটা তো বলাই বাহুল্য। যেকোনো বড় বা ছোট আন্দোলনের পেছনেই আমরা অংশগ্রহণকারীদের ‘আবেগ’ খুঁজে পাব। সেক্ষেত্রে ফুলবাড়ী কি আর নকশালবাড়ী কি! বরং আমাদের দেখা উচিত কোন কোন সুনির্দিষ্ট কারণে একটা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষের আবেগ দানা বেঁধে ঘনবদ্ধ হয়, এবং এই আবেগের ঘনত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে সে প্রাণদান করাকেও তখন তুচ্ছ করে প্রতিরোধের নিশান ওড়ায়। সাব-অলটার্ন স্টাডিজের তাত্ত্বিক গৌতম ভদ্র মূলত এই জায়গাটিকে ধরেই এখানকার কৃষক আন্দোলন, তিতুমীরের আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করেছেন। এবং সমাজতাত্ত্বিক কাজ করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

ক্ষমতাহীন একটি জনগোষ্ঠী কোন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে রাষ্ট্রের মুখোমুখি হয়ে আন্দোলনে টিকে থাকে, সেটা নিয়ে রণজিৎ গুহর দ্বারস্থ আমরা হতে পারি। রণজিৎ গুহ এটাকে দেখেছেন ‘নিম্নবর্ণের চৈতন্য’ হিসেবে। ‘উচ্চবর্গের চৈতন্য’ নানা রকমের হতে পারে। সে আন্দোলনে থাকতেও পারে, বা পালিয়েও আসতে পারে। কিন্তু নিম্নবর্গের চৈতন্য বোঝে আন্দোলন, প্রতিরোধে নিরন্তর জীবন বাজি রেখেই একমাত্র সে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলেই সে জমি থেকে উচ্ছেদ হবে, বাস্তুভিটা হারাবে। জমি ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানে বংশানুক্রমিক রক্তপাত। বংশানুক্রমিক রক্তপাত থেকে মুক্তি পেতে সে তাৎক্ষণিক রক্তপাতকে ভয় পায় না। চরম নিপীড়নের মুখে প্রতিরোধে টিকে থাকতে চায়। একজনের রক্তপাত দিয়ে ঠেকাতে চায় পারিবারিক, স্থানিক ও সামষ্টিক রক্তপাতকে, উচ্ছেদকে; বাস্তুভিটা হারানোকে। নিম্নবর্গের এই চৈতন্য রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন যত নৃশংস হয়, জ্যামিতিক হারে তত দানা বাঁধে। রণজিৎ গুহ insurgenc শব্দটা কৃষক বা নিম্নবর্গের এজেন্সি বা সচেতন ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ আকারে দেখছেন। এই বিদ্রোহগুলোকে অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্ত বলা হয়। কিন্তু গ্রামসির বরাত দিয়ে গুহ বলছেন–

‘As Antonio Gramsci...has said there is no room for pure spontaneity in history. This is precisely where they err who fail to recognize the trace of consciousness in the apparently unstructured movements of the masses’ (p. 5, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India)

আন্দোলন বা প্রতিরোধে টিকে থাকার অন্যতম উপাদান হচ্ছে ইস্যুর যৌক্তিকতা অর্থাৎ কী বিষয় নিয়ে তারা আন্দোলন করছে। ইস্যু যদি অস্তিত্বগত সংকটের হয়, তখন প্রতিরোধের শক্তি

কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে– এটা খুব সহজ সমীকরণ। ফুলবাড়ী ইস্যু ছিল ওখানকার কয়েকটি গ্রামের সাধারণ মানুষের অস্তিত্বগত সংকটের ইস্যু। কারণ একবার উচ্ছেদ হলে বংশপরম্পরায় যে উদ্বাস্তু হয়ে কাটাতে হবে– এই চৈতন্য নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের মানুষের রয়েছে। এই নিম্নবর্গের মানুষ কারা সেটা সামিনার লেখা থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি : *'অর্ধেকের বেশি মানুষ এসেছিল ফুলবাড়ী শহরে বাইরের নবাবগঞ্জ, পার্বতীপুর ও বিরামপুরের নানা গ্রাম থেকে।'*...সাঁওতাল, পাহান ও মুণ্ডা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকেরা তীর, ধুনক, ঢোল নিয়ে তাদের ঐতিহ্যগত সাজে সজ্জিত হয়ে এসেছিল। মহিলারা এসেছিল ঝাড়ু আর লাঠি নিয়ে। পুরুষদের সাথে ছিল বাঁশের তৈরি লাঠি। ফলে *'রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী ফুলবাড়ীতে নাগরিকদের রক্ষার বদলে জীবন কেড়ে নিতে উদ্যত হয়; তখন মানুষ উত্তেজনা-তাড়িত হয়ে সকল ভয়ভীতির উর্ধ্বে উঠে আন্দোলনকে অন্য রকম এক মাত্রা দান করে'* এই সিদ্ধান্ত টানাকে আমার কাছে সরল ও অপরিপক্ব মনে হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবেই এদেশের সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতায় রয়েছে যে রাষ্ট্রীয় বাহিনী সব সময় পুঁজিপতি, এলিট বা করপোরেটদের পক্ষেই কাজ করে। ফুলবাড়ীতে রাষ্ট্রীয় বাহিনী যে নাগরিকদের রক্ষার জন্য যায়নি, বরং তার বিরোধী শক্তি হিসেবে অবস্থান করছিল এটা সে সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিকভাবে অবগত ছিল। ফলে *'দমনকারী বাহিনীর জীবন কেড়ে নেয়ার ফলে উত্তেজনাগত কারণে সাধারণ মানুষ ভয়ভীতির উর্ধ্বে উঠে আন্দোলনকে অন্যরকম মাত্রা দান করে'*– এই পাঠ দিলে ফুলবাড়ী আন্দোলন ও গণপ্রতিরোধের শক্তিকে বুঝতে আমরা ব্যর্থ হব।

তাছাড়া এই পাঠে এক ধরনের স্ববিরোধিতাও লক্ষ করা গেছে। কারণ তিনি একবার বলেছেন, *'রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও চরমতম হুমকীর মুখেও ঘটনা পরবর্তী তাৎক্ষণিক উত্তেজনা এবং এলাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এই আন্দোলনের জনসম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে বলে কোন কোন আন্দোলনকারীর বয়ানে উঠে এলেও আমি তাতে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করি।'*
আবার তিনিই বলছেন, *'রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী নাগরিকদের জীবন রক্ষার বদলে জীবন কেড়ে নিতে উদ্যত হয়, তখন মানুষ উত্তেজনা-তাড়িত হয়ে সকল ভয়ভীতির উর্ধ্বে উঠে আন্দোলনকে অন্যতর মাত্রা দান করে।'*

এখানে 'তাৎক্ষণিক উত্তেজনা' ও 'উত্তেজনা-তাড়িত হয়ে' দুটি শব্দবন্ধ একই অর্থ বহন করে।

আবার তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন, *'শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক উত্তেজনা-তাড়িত হয়ে হাতে গোনা কয়েকজন আন্দোলনকারীর চরম প্রতিবাদী রূপই যে আন্দোলন-পরবর্তী ঘটনাসমূহকে চালনা করেছে তা নয়, বরং ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণেই ফুলবাড়ী আন্দোলন পরিপুষ্টতা লাভ করে।'*

তার মানে দাঁড়ায়, তিনি 'এলাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'কেও মেনে নিচ্ছেন। তাহলে তাঁর 'কিছুটা ভিন্নমত' কোথায়? আমার অজ্ঞতার কারণে হয়তো খুঁজে পাইনি।

এছাড়াও আন্দোলন ও প্রতিরোধে ধর্মীয় সাইন, প্রতীক, চিত্রকল্প, ঘটনা, উপাদান, নির্দিষ্ট আচার যে কত শক্তিশালীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, সেটা আমরা গৌতম ভদ্রের 'ইমান ও নিশান' গ্রন্থে জানতে পারি। ধর্মভাব, ধর্মীয় আচার-আচরণ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিপরীতে দাঁড়িয়ে ন্যায্য প্রতিরোধের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম, যেটা ফুলবাড়ীতেও ঘটেছে। গায়েবানা জানাজায় এলাকার মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা প্রতিবাদ আন্দোলনে শক্তি জোগায়।

এ বিষয়টিকে সামিনা দেখেছেন মৃতের প্রতি জীবিতদের দায়িত্ব পালনের অবশ্যকর্তব্যরূপে, ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলে 'ফরজে কিফায়া'। এই অবশ্যকর্তব্য অংশগ্রহণের জায়গাটিকে তিনি 'কর্তব্যবোধ' প্রত্যয়ের মাধ্যমে ধরেছেন। বেশ শক্তিশালীই মনে হচ্ছিল তাঁর বিশ্লেষণকে। কিন্তু তিনি তখনই এখানকার সেক্যুলারবাদী চিন্তাধারার খপ্পরে পড়েন যখন তিনি বলেন, *'এই জানাজায় সকলের অংশগ্রহণকে ধর্মচিন্তার বাইরে গিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়।'*

এখানে 'ধর্মচিন্তার বাইরে গিয়ে' এবং 'সামাজিক দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ' শব্দবন্দটি খেয়াল করার মতো। একেই বলে উচ্চবর্গের নির্মাণ। উচ্চবর্গ তার চিন্তা, দর্শন ও অবস্থান চিরকাল নিম্নবর্গের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং এখনো দেয়। তবে তাঁর এরকম ব্যাখ্যার জন্য শুধু তাঁকে একা দোষারোপ করা ঠিক হবে না। কারণ ধর্মীয় উপাদানগুলো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এরকম বিচার-বিশ্লেষণের প্রতাপ আমাদের এখানে প্রবল।

লেখক নিজেই বলেছেন, *'মুসলিম সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ কিংবা গণহত্যায় মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে জানাজার নামাজে ঐতিহ্যগতভাবেই ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। আর এটিকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক বিশাল প্রতিবাদ হিসেবেই দেখা হয়।'* কিন্তু লেখক ধরতে পারেননি, এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিশাল প্রতিবাদ হচ্ছে সাধারণ মানুষের ন্যায় ও সত্যের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ। এই অবস্থান গ্রহণের জন্য সে তখন আশ্রয় করে ধর্মীয় ভাষা তথা আচার-আচরণ। ধর্মীয় ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে সে তখন নিপীড়কের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সে তখন 'ধর্মচিন্তার বাইরে' যায় না, বরং তার অবস্থান থাকে ন্যায় ও সত্য নামক ধর্মভাবের মধ্যে। এবং এই 'ন্যায়ের' দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই সে 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণ করে।

ফুলবাড়ী আন্দোলন ও এর প্রতিরোধের শক্তিকে আমাদের গভীরভাবে পাঠ করতে হবে। একে বুঝতে হবে জমির সাথে মানুষের একাত্মবোধ, বংশপরম্পরায় উচ্ছেদভীতি এবং বংশধরদের রক্ষা, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতার প্রতি মমত্ব ও সংহতিবোধ প্রভৃতি জায়গা থেকে। শুধু আবেগ, তাৎক্ষণিক উত্তেজনা প্রভৃতি দিয়ে পাঠ করলে মানুষের ঐতিহাসিকভাবে অবস্থানগত অধিকার ও তার অন্যান্য মৌল মানবীয় ও ভূপ্রকৃতিগত সংশ্লিষ্টতাকে অস্বীকার করার ভয় থেকে যায়। ফুলবাড়ী আন্দোলন নিয়ে নানা পাঠ ও গবেষণা হওয়া উচিত। সামিনা লুৎফা সেটা শুরু করেছেন বলে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ইকতিজা আহসান: সম্পাদক, বিবিধ

ইমেইল: ektiza@gmail.com